এক টুকরো কথা

সৌরীন ভট্টাচার্য

এক যে ছিল টুকরো কথা। আজ মনে হয় সেদিন এমনই ছিল আমাদের রূপকথার শুরু। আমাদের মানে আমার আর আমার এক খুড়তুতো দাদার। সেও আজ আর নেই। তার কথা আগে লিখেছি এখানে ওখানে। তাই এখন আর কথা বাড়াচ্ছি না। তখন সেই ছিল আমার দিন-রাতের সঙ্গী। টুকরো কথা সেই দাদাই আনত। আমরা তখনও স্কুলের গণ্ডি পেরোইনি। আমার ওই দাদা বোধহয় সেবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। আমি দেব পরের বছর। পরের বছর অবশ্য সে পরীক্ষার নাম হয়ে যাবে স্কুল ফাইনাল।

'বিভাব-পত্রিকার টুকরো কথা সংখ্যা, ১৪০৯' নামের সাড়ে আঠাশ সেমি বাই বাইশ সেমি মাপের সত্যজিৎ-অক্ষর শোভিত বইটি, প্রকাশের সময় থেকেই আছে আমার সংগ্রহে। এই লেখার জন্য সেই বইয়ের পাতা ওল্টাতে গিয়ে নন্দিনী গুপ্তর 'ফিরে দেখা'-র মধ্যে একটা খুব সাধারণ কথায় এবার চোখ আটকে গেল। তাঁর ভাই অকালপ্রয়াত সুনন্দ গুহঠাকুরতা (বুড়্ঢা)-র কথা বলতে গিয়ে তিনি বলছেন : ''পঞ্চাশ দশকের সেই কয়েকটি বছর, সে ছিল 'সিগনেট বুক শপ'-এর প্রধান কর্মাধ্যক্ষ ও ডি কে-র কর্মযজ্ঞে সংশ্লিষ্ট কর্মী। এই বুকশপ-এর কাউন্টার থেকেও প্রত্যেক ক্রেতা ও আগ্রহী গ্রাহকদের হাতে সে তুলে দিত 'টুকরো কথা'-র এক একটি পর্ব।" আরে, তাহলে আমার সেই দাদা, নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য, নিশ্চয় এই বুড়্ঢাবাবুর কাছ থেকে নিয়েছে টুকরো কথার পর্ব। তাহলে মনে হয় আজ দেখা হলে দু-জনে হয়ত-বা দু-জনকে চিনতেও পারতেন। না, আমি কোনোদিন যাইনি পর্ব সংগ্রহ করতে। আমার চলাফেরার সীমানা তখনও কলেজ স্ট্রিট পর্যন্ত প্রসারিত হয়নি, এলগিন রোড কোনদিকে তা চিনতামও না। আমার দৌড় ছিল রাজাবাজার পর্যন্ত, তাও শিয়ালদার দিকটা।

আমি যে কথা বলতে চাই তা এই যে, 'টুকরো কথা' নিঃসন্দেহে আমার মতো অনেক কিশোরের সাহিত্য রুচিতে তাল দিয়েছে। কোনও কোনও সময়ে হয়ত আমাদের পাঠ নিয়ন্ত্রণও করেছে। কিন্তু এত সব কাণ্ড যে ঘটাচ্ছেন নরেশ গুহ নামের এক নেপথ্যচারী তা কিন্তু আমি সত্যিই তখন জানতাম না। দিলীপকুমার গুপ্ত, ডি কে লেজেণ্ডের ছোঁয়া পাচ্ছি, মানে দূর থেকে শুনছি, খুব বেশি কিছু বুঝছি তা হয়ত নয়। আমার মনে নরেশ গুহ, এই নাম দীর্ঘদিন ধরে জড়িয়ে ছিল 'দুরন্ত দুপুর'-এর সঙ্গে। বরঞ্চ যে-সময়ের কথা বলছি সেই সময়ে আমি কীভাবে যেন এলোমেলো চলতে চলতে পৌঁছে গিয়েছিলাম বুদ্ধদেব বসুর লেখায়। 'পরস্পর' পড়ে আমার কিছু একটা ঘটে গিয়েছিল। অনেক পরে একদিন নরেশবাবুকে, ততদিনে নরেশদাতে পৌঁছেও গেছি, কথাটা ওঁকে বলায় উনি, ওঁর ভাষায়, একটা উচ্চাঙ্গের হাসি দিয়ে বলেছিলেন, ও বয়সে ওই বই আমিও পড়িনি। হতেই পারে আমি কোনোভাবে দৈবাৎ হাতে

পেয়ে গিয়েছিলাম বইটা। আমাদের বাড়িতে তখন বইয়ের এমন কিছু সংগ্রহ ছিল না। থাকার কথাও না। ওপার থেকে এপারে চলে আসা ছিন্নমূল পরিবার। এসব যখনকার কথা তখনও পরিবারের টালমাটাল কাটেনি। কাজেই বই তখনও আমাদের স্বাভাবিক দৈনন্দিনের উপকরণ নয়।

আমাদের তখন ভরসা পাড়ার পাবলিক লাইব্রেরি। অল্প পয়সার চাঁদায় সদস্য হওয়া যেত, বই বাড়িতে আনা যেত। এইসব করেই আমরা চালাতাম। খুব যে কোনও অভাব বোধ ছিল তাও মনে হয় না। একটা ব্যাপার ছিল কাছাকাছি সবারই অবস্থা মোটের উপর একই রকম। কাজেই প্রত্যেকের চোখে প্রত্যেকেরটাই স্বাভাবিক ছিল। তারতম্য বেশি হলেই অভাববোধে রূপান্তর ঘটে আর দেখার চোখও আস্তে আস্তে বদলে যায়। তখনই সমস্যার শুরু হয়। তা যাক গে, যা বলছিলাম। বুদ্ধদেবের কথা আসছে এই কারণে যে, ওই পথেই আমি একদিন নরেশবাবু পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলাম। ব্যক্তিগত স্তরে এ কথাটার বিশেষ কোনও মানে নেই। কেননা এই যে পৌঁছবার কথা বললাম তা নিতান্তই বইপত্র আর লেখালেখির জগতের কথা। ছাত্র পর্বে। নরেশ গুহ বা চিনুদির সঙ্গে আমার পরবর্তী কালে যে যোগাযোগ তা অবশ্যই ব্যক্তিগত স্তরের কথা, কিন্তু সে অনেক পরের ব্যাপার। ফিরে আসি টুকরো কথার কথায়।

বললাম তো আমার মতো অনেক কিশোরের ও তরুণের চোখ মন ও রুচি খানিকটা অন্তত গড়ে উঠেছিল দিলীপ গুপ্ত, সিগনেট প্রেস ও টুকরো কথার পথে। শোভন রুচির বাংলা বই বলতে তখন আমরা এই আদলটাকেই বুঝছিলাম। তার নেপথ্যে নরেশদার ভূমিকা কতটা সে কথা তখন কিছুই জানতাম না। অনেক পরে যা জেনেছি সেও খানিক বাইরের থেকে জানা। কিন্তু এই 'বিভাব' সংকলন বইটি হাতে পেয়ে পঁচিশ বছরের ব্যবধানে রচিত নরেশ গুহের দুটি লেখা একসঙ্গে পড়তে পেয়ে আমাদের মনে কিছু অন্য কথা উঁকি দেয়। যে তৃপ্তির কথায় নরেশ গুহ লেখেন 'চাকরি যে এমন সুখের হ'তে পারে সে-কথা কে আগে জানত' তারই মধ্যে আমাদের পরিণত বয়সের চোখে কিছু যেন দুর্বলতার চিহ্ন চোখে পড়ে। গোটা আয়োজনটা কি একটু বেশি শৌখিনতার দিকে ঘেঁষে গিয়েছিল। আমাদের যে-কোনও কাজ তার পরিপার্শ্বের সঙ্গে যদি না কোনও সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারে তাহলে তা কি কিঞ্চিৎ খাপছাড়া হয়েই থাকে না? আমাদের কোনও কাজে আমরা কেউ যদি শুধু একাই 'ভাল' হতে চাই তবে সে ভালয় আখেরে কার ভাল? আমাদের সমবায়িতা ছেড়ে আমরা যদি বেশি বেরিয়ে যেতে চাই তাতে ক্ষতি কি শুধু আমাদেরই? সমবায়ের কি কিছু এসে যায় না তাতে? এসব প্রশ্ন তখন খুব ভাবা হয়েছিল কিনা কে জানে। সাহিত্য-সংস্কৃতির রুচি নির্মাণের যে প্রকল্প হাতে তুলে নেওয়া হয়েছিল সেদিন তা দিনের বিচারে অবশ্যই ছিল এক মহার্ঘ প্রয়াস। কিন্তু পরিপার্শ্বে খুব মন দেওয়া গিয়েছিল কিনা খটকা লাগে। সমবায়হীন একক আয়োজনের পক্ষে শেষ পর্যন্ত কি নিঃসঙ্গ শৌখিনতাই তার পরিণতি? জীবনানন্দের রূপসী বাংলা নামান্তরের মধ্যে কি কোনও গূঢ় ইঙ্গিত নিহিত আছে? কবির মৃত্যুর তিন বছর পরে প্রকাশিত এই বইয়ের নামকরণ কবির নয়। ৩১ জুলাই ১৯৫৭ তারিখে এই বইয়ের ছোট্ট এক ভূমিকা কথনের শেষে অশোকানন্দ দাশ লিখেছেন, ''কবির কাছে 'এরা প্রত্যেকে আলাদা-আলাদা স্বতন্ত্র সত্তার মতো নয় কেউ, অপরপক্ষে সার্বিক বোধে একশরীরী; গ্রামবাংলার আলুলায়িত প্রতিবেশপ্রসূতির মতো ব্যষ্টিগত হয়েও পরিপূরকের মতো পরস্পরনির্ভর...'। আমি যে-কথাটা বলতে চাই এখন তাতে এই ছোট উদ্ধৃতি প্রতীকের মতো কাজ করতে পারে। 'আলুলায়িত প্রতিবেশপ্রসূতির মতো ব্যষ্টিগত হয়েও পরিপূরকের মত পরস্পরনির্ভর' এই কথা শুধু গ্রামবাংলার জন্য প্রযোজ্য তাই নয়। জীবনের আরও অনেক অনেক কিছুই বাঁধা পড়ে এই রকমের পরিপূরকের মতো পরস্পরনির্ভরতায়। তা আমরা সব সময়ে টের পাই না। অথবা হয়ত-বা কিঞ্চিৎ ব্যষ্টিমোহ-আবরণে তা সব সময়ে ধরা পড়ে না আমাদের চোখে। পরিণতিতে জমে ওঠে শুধু বঞ্চনা। রূপসী বাংলা-র এই পর্বে নরেশ গুহ হয়ত আর ছিলেন না

এই ঘটনাবৃত্তে, ওই প্রতিবেশপ্রসূতির যেটুকু অঙ্গ তাই।

এর আগেই ১৯৫৬ সালে যাদবপুরে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন বিষয়ের নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে। তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের প্রধান হিসেবে সেখানে আসছেন বুদ্ধদেব বসু। যোগ্য সহযোগী হিসেবে অধ্যাপনার কাজে সেখানে চলে এলেন নরেশবাবু। সাহিত্য প্রকাশনার সৌকর্য থেকে বুদ্ধদেব তাঁকে নিয়ে এলেন সাহিত্যেরই অন্দরমহলে। কুশীলবেরা নিজেরা হয়ত তৎসাময়িক বর্তমানে ঘটনার দূরান্বয়ী তাৎপর্য দেখতে পান না তেমনভাবে কিন্তু অলক্ষ্যে যা হবার তা হয়েই যায়। যাদবপুরে নরেশবাবুর বাকি জীবন ধরে চলবে আর এক অন্য ব্রত উদ্‌যাপন।

ওই যে বলছিলাম আমাদের নিজেদের পরিণত বয়সের কথা। অনেক কথা অপরিণত বয়সে ঠিক চোখে পড়ে না, পড়ার হয়ত কথাও নয়। সেরকম আর একটা প্রসঙ্গও এবার চোখে লাগল। সেটা হয়ত আরও একটু সূক্ষ্ম তারের কথা এবং সে প্রসঙ্গে কথা বলার ভিত্তিও খুব দুর্বল। তবুও প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রসঙ্গে কথাটা যতই অস্বস্তির হোক আলোচনা করাই সংগত বলে মনে হয়। ওই টুকরো কথার দিনে, অর্থাৎ আমাদের বড় হয়ে ওঠার দিনে, প্রেমেন্দ্র মিত্র যে আমাদের চোখে কী ছিলেন তা আজকের পাঠককে বোঝানো শক্ত। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প কবিতা তো ছিলই, আমি তখন তাঁর উপন্যাসেরও যথেষ্ট গুণগ্রাহী। 'ধ্রুবতারার তপস্যা সবার জন্যে নয়', উপন্যাসের এইসব সংলাপে তখন আমরা মজে আছি। কিন্তু শুধু এসব হালকা কথা ছাড়াও, তখনকার লেখকদের চোখেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের যে-জায়গা, তা ওই বয়সেও আমরা বুঝতাম অসামান্য। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রের সে জায়গা কোথায় হারিয়ে গেল। কোনও অজ্ঞাত কারণে পাঠকেরা তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লেখকদের মনের স্বর্গ থেকেও তিনি নির্বাসিত হলেন। কল্লোল যুগের অচিন্ত্য-প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেবের মধ্যে এমনকি বুদ্ধদেবের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্কে কী যেন হয়ে গেল। ১৯৫৬-র যাদবপুরে অজিত দত্তের তুচ্ছ একটা কথাও আজ এতদিন বাদে মনে পড়ে। করিডোরে এক ছাত্রকে তিনি বলেছিলেন, শোনো, তোমাকে পিছন থেকে দেখে হঠাৎ মনে হচ্ছিল অল্প বয়সের প্রেমেন্দ্রকে দেখছি যেন। এইসব অযাচিত জলপানিতে ভরে ছিল আমাদের সেই বয়স। শুধু প্রেমেন্দ্র কেন, অচিন্ত্যও প্রায় একই রকমভাবে হারিয়ে গেলেন বাঙালি পাঠকের কাছে। আমাদের বড় হবার পথে পথে এ কথা অনেকবারই হানা দিয়েছে আমাদের মনে। নিজেদের মধ্যে কথা বলেছি। আজও হয় সে ধরনের কথা, যে দু-একজন এখনও রয়ে গেছি আমরা, তাদের মধ্যে। আমাদের মানব, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শেষ দিন পর্যন্তও বলে গেছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কথা। সে তো প্রেমেনদা বলেই বলত। আমাদের চোখের ওপরেই কেটে গেল অচিন্ত্য-প্রেমেন্দ্রের নিঃশব্দ শতবর্ষের বেলা। কালের পুতুল ও মহাকালের পাঠক, সবই বোঝা গেল, তবুও কিছু কথা কি তা সত্ত্বেও থেকে যায় না।

আমরাও যে নিজেরা একেবারে জল্পনা কল্পনা কিছু করিনি তাও নয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার বেলায় এ কথা অনেকবারই বলে থাকি আমি, অবশ্যই শুধু বন্ধুমহলে, খানিকটা ঘরোয়া কথার ধরনে, হয়ত একটু আধটু লিখেও বলেছি কখনও। কথাটা এই, প্রেমেন্দ্র মিত্র খানিকটা বোধহয় ঠকে গেলেন কবিতার ভাষার জন্য। আমার ব্যক্তিগত রুচি থেকে আমি দু-জন কবির কথা বলে থাকি, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আর প্রেমেন্দ্র মিত্র, এঁরা দু-জনেই, হয়ত ভিন্ন অর্থে, পাঠক প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে রইলেন সম্ভবত কবিতার ভাষার কারণে। তাও বাক্যটি লিখতে গিয়ে এখনও আবার খটকা লাগছে। এই দুই কবির নাম একই সঙ্গে উচ্চারণ করা ঠিক হচ্ছে কি?

প্রেমেন্দ্র মিত্র যে একটা সময়ে অনেকখানি জড়িয়ে গেলেন চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে সেটা কি লেখক-মনের স্বর্গ থেকে ওঁর নির্বাসনের জন্য কিছুটা কারণ হয়ে রইল? এ কথা আজকের কানে যতই অবিশ্বাস্য শোনাক, আমাদের অভিজ্ঞতাতেই আছে, এ জিনিস একদিন ছিল খুব বাস্তব। সংস্কৃতির

জাতপাতের বিচারে চলচ্চিত্র একদিন ছিল অনেকটাই অচ্ছুৎ। বাগ্‌ধারায় যা ছিল সিনেমায় নামা তা ছিল নেমে যাওয়ারই শামিল। অর্থাৎ, চলচ্চিত্রকে সংস্কৃতির জাতে উঠতে অনেক লড়াই করতে হয়েছে এবং সে অপেক্ষার কালও ছিল যথেষ্ট দীর্ঘ। এসব কথা শুধু আমাদের নন্দনতত্ত্ব দিয়ে বোঝা যাবে না, এ আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অঙ্গ। শুধু চলচ্চিত্রই বা কেন, থিয়েটার, গান, বাজনা ও নাচ, কোনও শিল্পকলারই সামাজিক যাত্রাপথ খুব মসৃণ হয়নি। তা সত্ত্বেও সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের সম্পর্কের মধ্যে টানাপোড়েনে কিছু বিশিষ্টতা হয়ত আছে। আমাদের হাতের কাছে প্রেমেন্দ্র মিত্র তার এক বড় নজির হয়ে রইলেন। এই সমস্যার নানা মাত্রা পরবর্তী কোনও গবেষকের হাতে হয়ত একদিন উদ্‌ঘাটিত হবে।

ইতিমধ্যে 'বিভাব' সংকলনের বড় বইটার পাতা ওলটাতে ওলটাতে এইসব লাইন আমাদের চোখে পড়বে।

''প্রেমেন্দ্র মিত্রের পঞ্চশর উপন্যাস সিগনেট সংস্করণ হয়ে পরিমার্জিত অবস্থায় পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে। এ বই উৎসর্গ করা হয়েছিল তাঁর বন্ধু শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে। যিনি এ উপন্যাস লিখেছিলেন আর যাঁকে উৎসর্গ করা হয়েছিল উভয়েই আজ সিনেমার রাহুগ্রস্ত। তাতে সিনেমার কী উপকার হয়েছে সে ভিন্ন কথা, কিন্তু সাহিত্যের তাতে ক্ষতি হয়েছে বিস্তর। এ বই যখন লেখা হয়েছিল তখন উভয় লেখকেরই সৃষ্টিশক্তির মধ্যাহ্ন সময়। উল্লেখযোগ্য নতুন কিছুই ছাপার অক্ষরে এঁরা আজকাল প্রকাশ করছেন না। পরিমার্জিত পঞ্চশর পাঠকের সেই ক্ষোভ মেটাবে বলে আশা করা যায়।''

''খবরটা নিশ্চয়ই ভালো যে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গল্প 'বরযাত্রী' সিনেমাতেও বিখ্যাত হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও খবর তাঁর নতুন দু'খানা গ্রন্থ প্রকাশ। এক : 'রূপান্তর', দুই : 'তোমরাই ভরসা'। সিনেমার প্রসঙ্গেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের নাম মনে পড়বে। এখন তিনি গা-ছম্‌-ছম্‌ নতুন এক ফিল্ম তুলতে ব্যস্ত আছেন। এ ধরনের ভুতে-পাওয়া আবহাওয়া সৃষ্টি করতে তিনি সিদ্ধহস্ত। ছবিটির নাম হবে—'হানা বাড়ি'।''

''আরও একজন বাঙালী সাহিত্যিক সম্প্রতি ফিল্মে যোগ দিলেন, সুমথনাথ ঘোষ। তাঁর ছবির নাম হবে ''দিগন্তের ডাক'', ঘাটশিলা গিয়েছিলেন তার শুটিং করতে। আগে সাহিত্যের শত্রু ছিল সাংবাদিকতা, অনেকের মতে সে সম্মান কেড়ে নিচ্ছে সেলুলয়েড ঘটিত ফিল্ম।''

এসব উদ্ধৃতি সেই সময়ের যখন আমরা বড় হচ্ছিলাম। আর আমরা যখন বুড়ো হচ্ছিলাম তখনও এই শহরের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে চলচ্চিত্রবিদ্যার নতুন বিভাগ খোলার প্রস্তাবে তুমুল বিরোধিতার মোকাবিলা করতে হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক নীতি নির্ধারণের কমিটির স্তরে এক দুর্দান্ত নামী অধ্যাপকের প্রশ্ন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া হবে নাকি সব রংচং মেখে ঘুরে বেড়াবে। ফিল্ম মেকিং আর ফিল্ম স্টাডিজ-এর ফারাক বোঝাতে সেদিন কালঘাম ছুটেছিল।

সৌরীন ভট্টাচার্য : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও বুদ্ধিজীবি।